রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বৌঠান

ফওজিয়া সুলতানা নাজলী

রবীন্দ্রনাথ

কাদম্বরী দেবী

রবীন্দ্রনাথ

গীতবিতানের প্রেম পর্যায়ের একটি বিখ্যাত গান ‘তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা’। যাকে কবি জীবনের ধ্রুবতারা বলে ঘোষণা করেছেন ‘সেই তুমিটি কে?’ ‘শূন্যপ্রাণ কাদে সদা’। রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন চৌদ্দ যখন তাঁর মায়ের মৃত্যু হয় । কবির জীবনে এটাই প্রথম মৃত্যুশোক। মাতৃহীন বালকের ভার নিলেন বাড়ীর কনিষ্ঠা বধূ জ্যোতিন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্ত্রী কাদম্বরী দেবী। কবির চেয়ে মাত্র দুই বছরের বড়। ১৬ বছর। এক অসাধারণ বিদুষী নারী, সাহিত্য প্রেমিক ছিলেন কাদম্বরী দেবী। সংগীত, অভিনয়েও পারদর্শী ছিলেন। রবীন্দ্র-মানস গঠনে এই অসামান্য নারীর দান চিরস্মরণীয়। ঠাকুর বাড়ির তিনতলায় তিনি গড়ে তুলেছিলেন ’’নন্দন কানন’। বসানো হয়েছিল পিল্লের উপর সারি সারি লম্বা পামগাছ, আশেপাশে নানা রং এর বাহারি ফুলের গাছ। ছিল নানারকম পাখি। রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্যবোধকে সবচেয়ে উঁচু তারে বেধেছিলেন নতুন বৌঠান কাদম্বরী দেবী । সেই বাধন কোনদিন শিথিল হয় নাই। সন্ধ্যাবেলা বসত পরিপাটি গানের আসর। মাদুরের উপর তাকিয়া, রুপোর রেকাবে ভিজে রুমালের উপর বেলফুলের গোড়ের মালা, এক-গ্লাস বরফজল, বাটা ভরতি ছাঁচি পান সাজান থাকত। কাদম্বরী চুল বেঁধে তৈরি হয়ে বসতেন সেখানে, রবীন্দ্র ধরতেন চড়া সুরে গান। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর তার রবিকাকার গান প্রসঙ্গে বলেছিলেন ‘একলা মানুষের কণ্ঠে হাজার পাখির গান’। সে গান সূর্য ডোবা আকাশে ছাদে ছাদে ছড়িয়ে যেত। ‘হু হু করে দখিনে বাতাস উঠত দূর সমুদ্র থেকে, তারায় তারায় যেত আকাশ ভরে।‘ রবীন্দ্রনাথের রোমান্টিক সৌন্দর্য-চেতনাকে জাগাবার জন্য এই পরিবেশ এই সৌন্দর্যদৃষ্টি ও কল্পনার একান্ত প্রয়োজন ছিল। যা বৌঠান তার ভালবাসার ছোঁয়া দিয়ে তৈরি করতেন। ‘এমনি ক’রেই যায় যদি দিন যাক না/মন উড়েছে উড়ক নারে মেলে দিয়ে গানের পাখ না’। শুধু গানই ছিল না, সেখানে বসতো রীতিমতো সাহিত্যপাঠের আসর। বৌঠানের প্রিয় কবি ছিলেন বিহারীলাল চক্রবর্তী। রবীন্দ্রনাথের সাথে বৌঠান সবসময় দুষ্টামী করতেন আর মজা করে বলতেন, ‘রবি সবচেয়ে কালো দেখতে, গলার যে কি অবস্থা, ওর

চেয়ে সত্য ভাল গায়। আরও বলতেন ‘কোনকালে বিহারী চক্রবর্তীর মত লিখতে পারবেনা’। রবীন্দ্রনাথের তখন শুধুই চেষ্টা কি করে এমন হবে যে বৌঠান আর কোন দোষ খুঁজে পাবে না তার মধ্যে। কাদম্বরী দেবী সবসময় সেই সাধনাটি করেছেন যাতে কেউ কোনদিন রবীন্দ্রনাথের দোষ খুঁজে না পায়। এভাবেই হয়ত তারা সাজিয়েছিলেন তাদের জীবন-বিতান। রবীন্দ্রনাথের ছেলেবেলার খেলার সাথী, বন্ধু, সব ছিলেন বৌঠান কাদম্বরী। নতুন বৌঠান রবির অস্তিত্বের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।
বর্ষার এক বৃষ্টি ঝরা বিকেলে রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন রবীন্দ্রনাথ সংগে ছিলেন বৌঠান কাদম্বরী দেবী। পথের ধারের কদম গাছটি অসংখ্য কদমফুলে ছেয়ে গিয়েছিল, নুয়ে যাওয়া কদম গাছ থেকে বৌঠান একটি ফুল ছিড়ে দেন রবির হাতে। তখনই কবি গেয়ে উঠেন ‘বাদল দিনে প্রথম কদম ফুল করেছ দান’। জোৎস্নালোকে পাশাপাশি বসে থাকতো তারা নীরবতার মধ্যে চলতো অজস্র কথা। জীবনের ১৬টি বছর একে অপরের আশ্রয়ে ছিলেন। কিন্তু একদিন সেই আশ্রয় হারিয়ে যায়, বাধন ছিন্ন হয়ে যায়, সব অতীত হয়ে যায়। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন ‘আমার ২৪ বছর বয়সের সময় মৃত্যুর যে পরিচয় হইল তাহা স্থায়ী পরিচয়।‘ এই মৃত্যু বৌঠান কাদম্বরী দেবীর আত্মহত্যা। কবি যাকে জীবনের ধ্রুবতারা বলে সম্বোধন করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তার প্রিয় বৌঠানের এইভাবে চলে যাওয়া কোনদিন মন থেকে মুছে ফেলতে পারেননি। দীর্ঘকাল পরেও রাণী চন্দকে বলেছিলেন ‘ নতুন বৌঠান মারা গেলেন, কি বেদনা বাজলো বুকে। মনে আছে সেই সময় আমি গভীর রাত পর্যন্ত ছাদে পায়চারী করেছি আর আকাশের দিকে তাকিয়ে বলেছি কোথায় তুমি নতুন বউঠান, একবার এসে আমায় দেখা দাও। কতদিন এমন হয়েছে সারারাত এভাবে কেটেছে। সেই সময় আমি এই গানটি গাইতুম বেশী। ‘আমার প্রাণের পরে চলে গেল কে/ বসন্তের এ বাতাসটুকুর মত/ সে যে ছুঁয়ে গেল নুয়ে গেল রে/ ফুল ফুটিয়ে গেল শত শত’।

বৌঠান কাদম্বরীর আত্মহনন, মৃত্যুটি ঘটে রবীন্দ্রনাথ মৃণালিনীর বিয়ের মাত্র সাড়ে চার মাসের মাথায়। বৌঠানের চলে যাওয়ার পরে সময়টা থমকে গিয়েছিল কবির জীবনে। বন্ধ করা স্তব্ধতা যেন! ভাবনায়, অনুভবে এবং স্বপ্নে চারিদিকেই বৌঠান। কাদম্বরীর মৃত্যুর দীর্ঘ দুই যুগ পর অমিয় চক্রবর্তীকে রবীন্দ্রনাথ এক চিঠির উত্তরে লিখেছিলেন ‘এক সময় যখন আমার বয়স তোমার মতো ছিল তখন আমি যে নিদারুণ শোক পেয়েছিলুম, সে ঠিক তোমারই মতো। আমার যে পরমাত্মীয় আত্মহত্যা করে মরেন আমার জীবনের পূর্ণ নির্ভর ছিলেন তিনি। তার আকস্মিক মৃত্যুতে আমার পায়ের নীচ থেকে যেন পৃথিবী সরে গেল, আমার জগৎ শূন্য হলো, আমার জীবনের স্বাদ চলে গেল। সেই শূণ্যতার কুহক কোনদিন ঘুচবে এমন কথা আমি মনে করতে পারিনি।‘ অন্য জায়গায় বলেছেন ‘সুর দিয়েই নতুন বৌঠানকে শোনাতুম। খুব ভালবাসতাম তাকে। তিনিও আমায় খুব ভালবাসতেন। মরে যে যায় সে যায়ই। আর তাকে দেখতে পাওয়া যায় না। শুনতাম ডাকলে না কি আত্মা এসে দেখা দেয়। সে ভুল’ ।

বৌঠানের মৃত্যুর পরের মাসেই যে বইটি রবীন্দ্রনাথ কাদম্বরীকে উৎসর্গ করেন, সেই কাব্যগ্রন্থ শৈশব-সংগীত। লিখেছিলেন ‘এই কবিতাগুলি তোমাকে দিলাম, বহুকাল হইল তোমার কাছে বসিয়াই লিখিতাম, তোমাকে শুনাইতাম। সেই সমস্ত স্মৃতি ইহাদের মধ্যে বিরাজ করিতেছে। তাই মনে

হইতেছে তুমি যেখানেই থাক না কেন, লেখাগুলি তো চোখে পড়িবেই।‘ শৈশব-সংগীতের এক মাস পরেই প্রকাশিত হল ভানু সিংহের পদাবলী এটিও উৎসর্গ কাদম্বরীকে। লিখেছেন ‘ভানু সিংহের কবিতাগুলি ছাপাইতে তুমি আমায় অনুরোধ করিয়াছিলে। তখন সে অনুরোধ পালন করি নাই। আজ ছাপাইয়াছি। আজ আর তুমি দেখিতে পাইলে না’। সে যে তার চলে যাওয়া, অকালে হারিয়ে যাওয়া, সেই রমণীটি কি কবিকে নিবিড় বেদনাতে ভালবাসার ঘায়ে সারা জীবন কাঁদাল? লিখেছেন ‘সে দিন ভেসে গেছে চোখের জলে/ নিবিড় সুখে মধুর দুঃখে জড়িত ছিল সেই দিন/ দুই তারে জীবনের বাঁধা ছিল বীণ/তার ছিড়ে গেছে কবে একদিন কোন হাহাকারে/সুর হারিয়ে গেল পলে পলে’। কাদম্বরী দেবীর মৃত্যুর বর্ষপূর্তিতে স্মৃতিচারণায় কবি লিখেছেন ‘সে আমার জীবনের খেলাঘর এখান হইতে ভাঙ্গিয়া লইয়া গেছে, যাবার সময় সে আমাকে তাহার শেষ ভালবাসা দিয়া গেছে। এই মৃত্যুর দেশে, এই জগতের মধ্যাহ্ন-কিরণে কি তাহার সেই ভালবাসার উপহার প্রতি মুহূর্তেই শুকাইয়া ফেলিব। আমার সংগে তাহার যখন দেখা হইবে তখন কি তাহার আজীবনের এত ভালবাসার পরিণাম স্বরূপ আর কিছুই থাকিবে না, আর কিছুই তাহার কাছে লইয়া যাইতে পারিব না-কেবল কতগুলি নীরস স্মৃতির শুষ্কমালা। সে গুলি দেখিয়া কি তাহার চোখে জল আসিবে ন।‘ ষাট বছর বয়সে কিশোর প্রেম কবিতায় কবি লিখেছেন ‘তখন জানা ছিল না ভালবাসার ভাষা/ যেন প্রথম দক্ষিণ বায়ে/শিহরণ লেগেছিল গায়ে চাঁপা-কুড়ির বুকের মাঝে অস্ফুট কোন আশা/সে যে অজানা কোন ভাষা’। সত্তর ঊর্ধ্ব কবির সেই হারানো প্রিয়জনের জন্য ব্যাকুল ক্রন্দন ‘তুমি কোথায়?’ যার জন্য কবির এই বিষাদ কান্না ছিল মৃত্যুকালে তার বয়স ছিল ২৫ আর কবির বয়স ২৩ । কাদম্বরী দেবীকে হারানোর সেই শোক, সেই বেদনা পরে তাকে বড় বেশী বিচলিত বড় বেশী অস্থির করেছিল। কবি নিজেই সুস্পষ্ট ভাবে বলেছেন ‘মুখের হাসি থাকে মুখে/ দেহের পুষ্টি পোষে দেহ/ প্রাণের ব্যথা কোথায় থাকে/ জানে না তার খবর কেহ’। কবি তার আর এক কবিতায় বলেছেন ‘কাব্য পড়ে যেমন ভাবো/ কবি তেমন নয় গো।

‘আসা যাওয়ার পথের ধারে’ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের হৃদয়কে ব্যথিত করেছে বৌঠান কাদম্বরী দেবীর স্মৃতি, রেখে যাওয়া স্মরণ চিহ্ন।

কবির যে কান্না, যে কষ্ট যা মনের আগুন হয়ে বুকের মধ্যে সারাজীবন জ্বলেছে তার পরিচয় আমরা কতটুকু পেয়েছি।? রবীন্দ্রনাথের জীবনের এই কান্নাটি ছিল যেন বিষণ্ণ মেঘ থেকে ঝরে পড়া শ্রাবণের বারিধারা।